গ বিভাগ

খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করেছি। এ অধ্যায়ে আমরা খাদ্যের ছয়টি উপাদানের উৎস ও কাজ সম্পর্কে জানব। এছাড়া পরিপাক ও শোষণের গুরুত্ব, মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠী, সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় মৌলিক খাদ্যগোষ্ঠীর ব্যবহার, বিভিন্ন রোগে পথ্য পরিকল্পনা ও পদ্ধতির ধারণা লাভ করব। খাদ্যসামগ্রী যাতে নষ্ট না হয় এজন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেও খাদ্য সংরক্ষণ করতে জানাও আমাদের জন্য অতি জরুরি।

এ বিভাগ শেষে আমরা

- খাদ্য ও উপাদানগুলোর প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুষম খাদ্য ও খাদ্যের মৌলিক গোষ্ঠী বর্ণনা করতে পারব।
- খাদ্য পরিবেশনে পরিমাপের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন রোগের পথ্য ও পথ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।
- পচনশীলতার ভিত্তিতে খাদ্যের শ্রেণিবিভাগ করে খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য উপাদান, পরিপাক ও শোষণ

খাদ্য উপাদানের প্রকারভেদ, উৎস ও কাজ

আমরা জানি যে, খাদ্যকে ভাঙলে যে বিভিন্ন ধরনের জৈব রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায় তাদেরকে খাদ্য উপাদান বলে। এই উপাদানগুলো আমাদের শরীরে পুষ্টি সাধন করে, তাই এদেরকে পুষ্টি উপাদানও বলে। আমাদের খাদ্যে প্রধানত ছয় প্রকারের খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায় যা নিচের ছকে দেখানো হলো।

খাদ্য উপাদান বা পুষ্টি উপাদান

প্রোটিন | কার্বোহাইড্রেট | স্নেহ পদার্থ | ভিটামিন | খনিজ লবণ | পানি

আমরা এখন উল্লিখিত উপাদানগুলো সম্পর্কে জানব।

পাঠ ১ – প্রোটিন

প্রোটিন– খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিন ছাড়া কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। এজন্য প্রোটিনকে সকল প্রাণের প্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। সব প্রোটিনই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। প্রোটিনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাঙলে প্রথমে এমাইনো এসিড এবং পরে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেক এমাইনো এসিড পাশাপাশি যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন অণু গঠিত হয়। নিচে একটা প্রোটিন অণুর রেখাচিত্র দেখানো হলো।

অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড–অ্যামাইনো এসিড-------

← প্রোটিন অণু →

প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ–

উৎস অনুযায়ী প্রোটিনকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়

উৎস অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ

প্রাণিজ প্রোটিন | উদ্ভিজ্জ প্রোটিন

(১) **প্রাণিজ প্রোটিন–** যে প্রোটিনগুলো প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ প্রোটিন বলে। যেমন– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। এই প্রাণিজ প্রোটিনকে প্রথম শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

(২) **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন–** উদ্ভিদ জগৎ থেকে প্রাপ্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলা হয়। যেমন– ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি ইত্যাদি এই উদ্ভিজ্জ প্রোটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়।

প্রোটিনের উৎস–

প্রোটিনজাতীয় খাদ্য।

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ২০ থেকে ২৫ ভাগ প্রোটিনজাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত। প্রতিদিন খাবারে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পাশাপাশি কিছু পরিমাণে প্রাণিজ প্রোটিনও গ্রহণ করতে হবে।

প্রোটিনের কাজ

১। **দেহ গঠন ও বৃদ্ধিসাধন –** আমাদের দেহের অস্থি, পেশি, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্ত কণিকা হতে শুরু করে দাঁত, চুল, নখ পর্যন্ত প্রোটিন দিয়ে তৈরি। প্রোটিন শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধি সাধন করে।

২। **ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ –** আমাদের দেহের কোষগুলো প্রতিনিয়তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয়প্রাপ্ত স্থানে নতুন কোষগুলো গঠন করে ক্ষয়পূরণ করতে ও কোনো ক্ষতস্থান সারাতে প্রোটিনের ভূমিকা রয়েছে।

৩। **তাপশক্তি উৎপাদন–** ১ গ্রাম প্রোটিন থেকে ৪ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। যখন দেহে ফ্যাট ও কার্বোহাইড্রেটের ঘাটতি থাকে তখন প্রোটিন তাপ উৎপাদনের কাজ করে থাকে।

৪। **দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি অর্জন–** রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের দেহে তাদের প্রতিরোধী পদার্থ বা অ্যান্টিবডি তৈরি করা প্রোটিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫। **মননশক্তির বিকাশ –** মানসিক বিকাশ বা মস্তিস্কের বিকাশের জন্য প্রোটিন অপরিহার্য।

দেহে প্রোটিনের অভাব হলে

- বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
- দীর্ঘদিন ধরে খাদ্যে প্রোটিনের ঘাটতি থাকলে কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- মেধা কমে যায়।

কাজ – ১ দৈনিক যে প্রোটিন জাতীয় খাবারগুলো গ্রহণ করা হয়, তার নাম লেখো।
কাজ – ২ তোমার দেহে প্রোটিন কোন কোন কাজ করে থাকে, তা লেখো।

পাঠ ২– কার্বোহাইড্রেট

আমরা দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করি তার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য এদের গুরুত্ব বেশি। সকল কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন– এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ– কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে সরল চিনি অণু পাওয়া যায়। সরল চিনি অণুর উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১। **মনোস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেট একটিমাত্র সরল চিনির অণু দিয়ে গঠিত তাকে মনোস্যাকারাইড বলে। যেমন– গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ।

২। **ডাইস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২টি মনোস্যাকারাইড বা সরল চিনি পাওয়া যায় তাকে ডাইস্যাকারাইড বলে। যেমন– সুক্রোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ।

৩। **পলিস্যাকারাইড–** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে ভাঙলে ২-এর অধিক একক মনোস্যাকারাইড পাওয়া যায়, তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন– স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ।

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণিবিভাগ

মনোস্যাকারাইড	ডাইস্যাকারাইড	পলিস্যাকারাইড
• গ্লুকোজ	• সুক্রোজ	• স্টার্চ
• ফ্রুকটোজ	• ল্যাকটোজ	• গ্লাইকোজেন
• গ্যালাকটোজ	• মলটোজ	• সেলুলোজ

কার্বোহাইড্রেটের খাদ্য উৎস

নিচে খাদ্যগুলোকে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থেকে কম অনুযায়ী সাজানো হলো–

১। চিনি, গুড়, মিছরি, ক্যান্ডি, চকলেট, মিষ্টি
২। সাগু, এরারুট
৩। চাল, ভুট্টা, যব, গম
৪। আলু
৫। বিভিন্ন ধরনের শুকনা ফল যেমন– খেজুর, কিশমিশ ইত্যাদি
৬। বিভিন্ন ধরনের ডাল, সয়াবিন, বাদাম
৭। টাটকা ফল, আঙুর, কলা, আপেল, আম, কাঁঠাল, আনারস ইত্যাদি

দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৫০ থেকে ৬০ ভাগ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ করা উচিত।

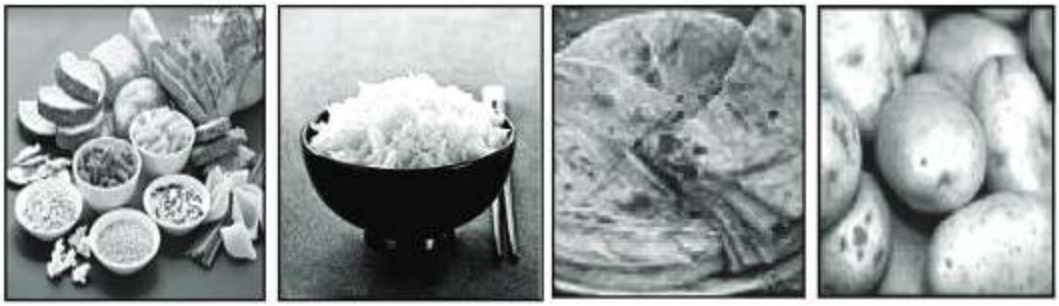

বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য

কার্বোহাইড্রেটের কাজ

(১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই কার্বোহাইড্রেটের প্রধান কাজ। এজন্য একে জ্বালানি খাদ্য বলে। ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থেকে ৪ কিলো ক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

(২) সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

(৩) মস্তিষ্কের কাজ সচল রাখার জন্য একমাত্র জ্বালানি হিসাবে গ্লুকোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

দেহে কার্বোহাইড্রেটের অভাব হলে

দেহের জন্য প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়। ফলে শরীর দুর্বল হয় ও স্বাভাবিক কাজ করার শক্তি কমে যায়।

কাজ ১– তুমি কেন কার্বোহাইড্রেটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ৩– স্নেহ পদার্থ

খাদ্যের ছয়টি উপাদানের মধ্যে স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটই সবচেয়ে বেশি শক্তি উৎপন্ন করে। প্রায় সব প্রাকৃতিক খাদ্যবস্তুর মধ্যে এদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। স্নেহ জাতীয় পদার্থ পানিতে অদ্রবণীয় এবং পানির চেয়ে হালকা।

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফ্যাটের শ্রেণিবিভাগ– ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) কঠিন স্নেহ এবং (২) তরল স্নেহ।

(১) **কঠিন স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে কঠিন আকৃতির হয় সেগুলোকে কঠিন স্নেহ বলে। যেমন–প্রাণীর চর্বি, মাখন ইত্যাদি।

(২) **তরল স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ স্বাভাবিক তাপে ও চাপে তরল অবস্থায় থাকে সেগুলোকে তরল স্নেহ বলে। যেমন–সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

খ) উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থের শ্রেণিবিভাগ– উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়– (১) **উদ্ভিজ্জ স্নেহ ও (২) প্রাণিজ স্নেহ।**

(১) **উদ্ভিজ্জ স্নেহ–** যেসব স্নেহ পদার্থ উদ্ভিদ জগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে উদ্ভিজ্জ স্নেহ বলে। যেমন– নারিকেল তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

(২) **প্রাণিজ স্নেহ –** যেসব স্নেহ পদার্থ প্রাণিজগৎ থেকে পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাণিজ স্নেহ বলে। যেমন– গরুর চর্বি, ঘি, মাখন, মাছের তেল ইত্যাদি।

খাদ্য উৎস

(১) **প্রথম শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ৯০% থেকে ১০০%। সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, সরিষার তেল, কড মাছের তেল বা হাঙর মাছের তেল ইত্যাদি।

(২) **দ্বিতীয় শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ৪০% থেকে ৫০%। বিভিন্ন ধরনের বাদাম যেমন– চীনাবাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তাবাদাম, আখরোট, নারিকেল ইত্যাদি।

(৩) **তৃতীয় শ্রেণির উৎস–** এখানে স্নেহের পরিমাণ ১৫% থেকে ২০%। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি।

আমাদের খাদ্যে দৈনিক ক্যালরির ২০% থেকে ২৫% স্নেহ পদার্থ থেকে গ্রহণ করা উচিত। ফ্যাট বা স্নেহ-জাতীয় খাদ্য প্রয়োজনের চাইতে বেশি খেলে তা শরীরের কোনো কাজে লাগেনা এবং দেহে ফ্যাট আকারে জমা থাকে। যার ফলে দেহের ওজন খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। তাই ফ্যাটজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন প্রকার ফ্যাটজাতীয় খাদ্য

স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাটের কাজ–

১। স্নেহ পদার্থের প্রধান কাজ হলো তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ থেকে দেহে ৯ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়।

২। দেহে শক্তির উৎস হিসাবে সঞ্চিত থাকে।

৩। কোষ প্রাচীরের সাধারণ উপাদান হিসেবে স্নেহ পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪। ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-কে দ্রবীভূত করে দেহে গ্রহণ উপযোগী করে তোলে।

৫। দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলোকে সংরক্ষণের জন্য স্নেহ পদার্থের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

৬। দেহ হতে তাপের অপচয় রোধ করে শরীর গরম রাখে।

৭। স্নেহ পদার্থ চর্মরোগের হাত থেকে রক্ষা করে।

৮। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

ফ্যাটের অভাবে দেহে–

- প্রয়োজনীয় তাপশক্তির ঘাটতি হয়।
- চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলোর ঘাটতি দেখা যায়।
- চর্মরোগ দেখা দিতে পারে।

কাজ ১– তুমি প্রতিদিন যে ফ্যাটজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করো সেই খাবারগুলোর তালিকা করো।
কাজ ২– ফ্যাটজাতীয় খাদ্য তোমার শরীরে কী ধরনের কাজ করে তা লেখো।

পাঠ ৪– ভিটামিন

ভিটামিন হলো খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রকার জটিল জৈব রাসায়নিক যৌগ যা জীবদেহে খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয়। আবার এদের উপস্থিতি ছাড়া জীবদেহের শক্তি উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়, সুষ্ঠু স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্ভব হয় না এবং এই যৌগগুলোর অভাবে বিভিন্ন ধরনের অপুষ্টিজনিত রোগ দেখা যায়। দেহে এই অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলোর চাহিদা খুব সামান্য। কিন্তু এর কাজকে সামান্য বলা যায় না। কারণ দেহ গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, অভ্যন্তরীণ কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি কাজই ভিটামিনের উপস্থিতি ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

ভিটামিনের শ্রেণিবিভাগ

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

(১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যে ভিটামিনগুলো চর্বিতে বা চর্বি দ্রাবকে দ্রবীভূত হয় কিন্তু পানিতে অদ্রবণীয় তাদেরকে চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। এই ভিটামিন ৪টি, যথা– এ, ডি, ই এবং কে।

(২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন– যে ভিটামিনগুলো পানিতে খুব সহজেই দ্রবীভূত হয় কিন্তু চর্বিতে অদ্রবণীয় তাকে পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন বলে। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন প্রধানত দুই ধরনের।

যথা—ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স ও ভিটামিন–সি।

ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স– ভিটামিন 'বি' কোনো একক ভিটামিন নয়। প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ভিটামিনকে একসাথে ভিটামিন বি–কমপ্লেক্স বলা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো থায়ামিন বা $বি_১$, রিবোফ্লাভিন বা $বি_২$, ফলিক এসিড।

ভিটামিনের উৎস

প্রাণিজ উৎস– সামুদ্রিক মাছ, ডিমের কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধজাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস– ঢেঁকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু, বিভিন্ন ধরনের সবুজ শাক, ধনেপাতা, লেটুস পাতা, বিভিন্ন ধরনের সবজি যেমন– ঢেঁড়স, মাশরুম, পেঁপে, চিচিংগা, লাউ, বেগুন, ধুন্দল, টমেটো, বিট। ওলকপি, ব্রোকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বরবটি, মুলা, করলা, উচ্ছে, গমের

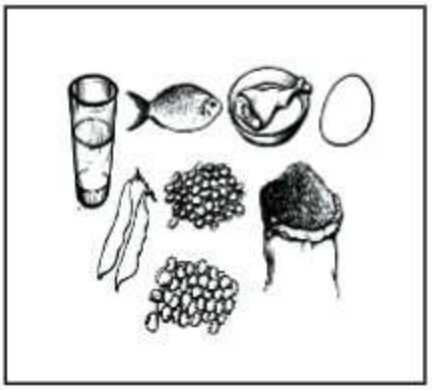

ভিটামিনসমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্য

অঙ্কুর, অঙ্কুরিত ছোলা, মটরশুঁটি, মিষ্টি কুমড়া, গাজর, কাঁচা কাঁঠাল, বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন- আমলকী, পেয়ারা, আমড়া, আতা, সফেদা, গাব, বরই, কুল, জাম্বুরা, বেল, লেবু, পাকা টমেটো, কমলালেবু, কামরাঙ্গা, পাকা পেঁপে, আম, পাকা কাঁঠাল ইত্যাদি।

ভিটামিনের কাজ

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে।
- স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কর্মদক্ষতা ঠিক রাখে।
- চোখ ও ত্বকসহ বিভিন্ন অংশের সুস্থতা রক্ষা করে।
- রক্ত গঠনে সাহায্য করে।
- শরীরে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের যথাযথ ব্যবহার করে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতা অটুট রাখে।

অভাবজনিত রোগ– বিভিন্ন ধরনের ভিটামিনের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়।

যেমন–

ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাবে বেরিবেরি, মুখে ঘা, ঠোঁটের কোনা ফেটে যাওয়া, পেলেগ্রা চর্মরোগ ও মানসিক বিষাদ, এনিমিয়া রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

ভিটামিন সি-এর অভাবজনিত রোগ

স্কার্ভি রোগ হয় (দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় ও স্পঞ্জের মতো হয় আর রক্ত পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ–

চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন	অভাবজনিত রোগ
ভিটামিন- এ	রাতকানা রোগ হয় (রাতের বেলায় অল্প আলোতে দেখতে পায় না)।
ভিটামিন- ডি	শিশুদের রিকেট হয় (পায়ের হাড় বেঁকে যায় ও মাথার খুলি বড় দেখায়) এবং বড়দের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ (হাড় নরম ও ভঙ্গুর হয়ে যায় আর বেঁকে যায়)।
ভিটামিন- ই	প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

কাজ ১– বিভিন্ন ভিটামিনের খাদ্য উৎসের নাম লেখো।

পাঠ ৫– খনিজ লবণ বা ধাতব লবণ

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরই মিনারেলস বা খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। দেহের উপাদানের শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ জৈব পদার্থ এবং ৪ ভাগ অজৈব পদার্থ বা খনিজ পদার্থ। দেহে প্রায় ২৪ প্রকার

বিভিন্ন খনিজ পদার্থ রয়েছে। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, আয়োডিন, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল ইত্যাদি খনিজ পদার্থ দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এগুলো খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হয়। দীর্ঘদিন খনিজ লবণের ঘাটতিতে নানা প্রকারের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। খাদ্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় ধাতব লবণ পেয়ে থাকি।

শ্রেণি বিভাগ– পরিমাণের মাপকাঠিতে এদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

(১) প্রধান খনিজ লবণ– অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও গন্ধক প্রাণী দেহে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অবস্থান করে। এদের প্রধান খনিজ লবণ বলে।

(২) লেশ মৌল খনিজ লবণ– লৌহ, আয়োডিন, ক্লোরিন, জিংক, ম্যাঙ্গানিজ, তাম্র, কোবাল্ট, মলিবডেনাম ইত্যাদি খুব সামান্য পরিমাণ দেহের পুষ্টি কাজে অংশ নেয় বলে এসব মৌলকে লেশ মৌল খনিজ লবণ বলা হয়। কিন্তু এগুলো খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খনিজ লবণের বিভিন্ন খাদ্য উৎস

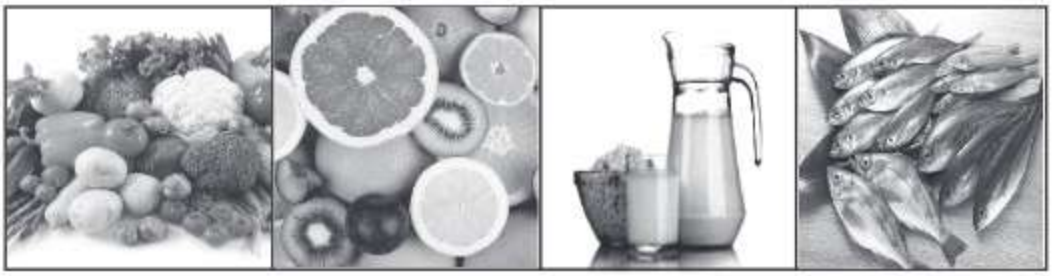

খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য

প্রাণিজ উৎস– সামুদ্রিক মাছ, কাঁটাসহ ছোট মাছ, ডিমের-কুসুম, মাংস, যকৃৎ, পনির, দুধ ও দুধ জাতীয় খাদ্য।

উদ্ভিজ্জ উৎস– বিভিন্ন ধরনের সবুজ সবজি ও ফল, ঢেঁকিছাঁটা চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মিষ্টি আলু ইত্যাদি।

ধাতব লবণ বা খনিজ পদার্থের কাজ– আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাদ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থগুলো আমাদের দেহে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। নিচের ছকে এদের সাধারণ কাজগুলো দেওয়া হলো–

- কঠিন কোষকলা, যেমন–হাড় ও দাঁত গঠন করে
- রক্ত গঠন করে
- হরমোন গঠনে সহায়তা করে
- অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে

বিভিন্ন খনিজ পদার্থের অভাবের ফল

বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণের অভাবে বিভিন্ন ধরনের অভাবজনিত লক্ষণ দেখা দেয়। যেমন–

খনিজ পদার্থ	অভাবজনিত রোগ
ক্যালশিয়াম	ক্যালসিয়ামের অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হয়, দাঁত ও হাড়ের গঠন ব্যাহত হয়। শিশুদের রিকেট ও বড়দের ওস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়।
সোডিয়াম	রক্তচাপ কমে যায় ও পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
পটাশিয়াম	পেশির দুর্বলতা দেখা দেয়।
আয়োডিন	গলগণ্ড রোগ হয়।
লৌহ	এনিমিয়া বা রক্ত-স্বল্পতা হয়।
জিংক	শিশুদের বর্ধন ব্যাহত হয়।

কাজ ১– খনিজ লবণসমৃদ্ধ খাদ্য কেন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা বর্ণনা করো।

পাঠ ৬– পানি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানি অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ কয়েক সপ্তাহ খাবার না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পানি না খেয়ে এক দিনের বেশি থাকতে পারে না। মানুষের দেহ ৫৫% থেকে ৭৫% পানি দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল টিস্যুতেই পানি থাকে। প্রতিদিন মল, মূত্র, ফুসফুস ও চামড়ার মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় এবং মানুষের দেহ পানি সঞ্চয় করে রাখতে পারে না।

তাই প্রতিদিনই বিশুদ্ধ পানি পান করতে হয়। কী পরিমাণ পানি পান করতে হবে তা নির্ভর করে কী ধরনের পরিশ্রম করা হচ্ছে, কী খাবার খাওয়া হচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ের উপর। প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি শরীর থেকে বেরিয়ে যায় সেই পরিমাণ পানি পান করা প্রয়োজন। খাবার থেকে প্রায় ১ লিটার পানি পাওয়া যায় এবং বাকিটা তরল পানীয় থেকে পেতে হবে। গড়ে একজন মানুষের প্রতিদিন ২.৫ থেকে ৩ লিটার পানি শরীর থেকে বের হয়ে যায়। খুব বেশি গরম আবহাওয়ায় ও অধিক পরিশ্রমে শরীরে পানি বেশি প্রয়োজন হয়। যারা উড়োজাহাজে ভ্রমণ করেন তাদের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা উড়োজাহাজে ভ্রমণের জন্য প্রায় ১.৫ লিটার পানি বের হয়ে যায়।

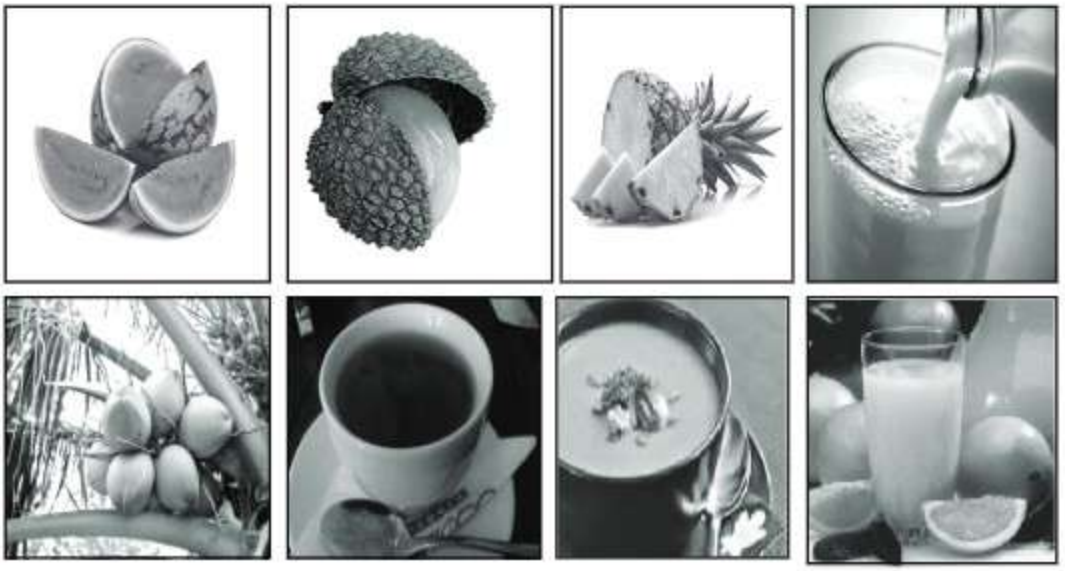

পানির বিভিন্ন খাদ্য উৎস

পানির উৎস– পানির প্রধান উৎস হচ্ছে খাবার পানি, ডাবের পানি, দুধ, ফলের রস, সুপ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের পানীয়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের রসালো ফল, যেমন– লিচু, জামরুল, তরমুজ ইত্যাদিতেও প্রচুর পরিমাণে পানি থাকে।

পানির কাজ

- শরীরের প্রতিটি কোষের স্বাভাবিক কাজ বজায় রাখার জন্য পানির প্রায়োজন হয়।
- শরীর থেকে বর্জ্য পদার্থ বের করার জন্য পানির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।
- শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার জন্য পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে।
- কোষে পুষ্টি উপাদান পরিবহণে সাহায্য করে।

শরীরে পানির পরিমাণ খুব কমে গেলে সেই অবস্থাকে ডিহাইড্রেশন বা পানি স্বল্পতা বলে। এর লক্ষণগুলো হলো মাথাধরা, দুর্বল লাগা, ঠোঁট শুকিয়ে যায় বা ফেটে যায়, মূত্রের রং গাঢ় হলুদ হয়। এই ডিহাইড্রেশনের কারণগুলো হলো–

- অতিরিক্ত গরম আবহাওয়া, আর্দ্রতা, ব্যায়াম অথবা জ্বরের কারণে ঘাম বেশি হওয়া।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান না করা।
- ডায়রিয়া হওয়া।
- অতিরিক্ত বমি হওয়া।

কখন শরীরে পানির চাহিদা বাড়ে– দিনে ৬ থেকে ৮ গ্লাস পানির প্রয়োজন হয়। তবে পানির চাহিদা নিম্নলিখিত অবস্থায় বেড়ে যায়–

- খুব বেশি গরম আবহাওয়ার কারণে অনেক ঘাম হলে
- জ্বর হলে
- ডায়রিয়া হলে ও বমি হলে
- অনেক বেশি পরিশ্রম করলে, খেলাধুলা করলে বা ব্যায়াম করলে
- খাবারে আঁশজাতীয় খাদ্য বেশি থাকলে পানি বেশি খেতে হয়
- স্তন্যদাত্রী মায়ের পানির চাহিদা বেশি হয়

কাজ ১– কোন কোন অবস্থায় পানির চাহিদা বাড়ে?

পাঠ ৭ – খাদ্য পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজনীয়তা

আমরা খাবার খাওয়ার দৃশ্যটি চোখে দেখি। বাকি যে কাজগুলো শরীরের ভেতর ঘটে থাকে সেই ঘটনাগুলো আমরা চোখে না দেখলেও অনুভব করি। যেমন– খাবার খাওয়ার ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা পর ক্ষুধা লাগে। খাবার পরিপাক হয়ে শোষিত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের ক্ষুধা লাগে। আবার বেশ কিছুদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ না করলে শরীরে নানা প্রকার অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। এই বিষয়গুলো থেকে বুঝতে পারি যে, খাবার খাওয়ার পর শরীরের অভ্যন্তরে এমন কিছু কাজ ঘটে থাকে যার ফলে শরীরের পুষ্টি সাধন হয়, আমরা সুস্থ থাকি, আমাদের ক্ষুধা লাগে এবং ক্ষুধা নিবৃত্ত করার জন্য আবার খাদ্য গ্রহণ করে থাকি।

তাহলে প্রশ্ন আসে, খাওয়ার পর শরীরের মধ্যে কী ঘটে এবং এর পরিণতিতে কী হয়? আমরা যে খাবারগুলো খাই, সেই খাবারের প্রতিটিতেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান থাকে। এই পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় খাদ্যের মধ্যে অবস্থান করে। যে অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো খাদ্যের মধ্যে থাকে সেই অবস্থায় শরীরে কোনোভাবেই কাজে লাগতে পারে না বা দেহের পুষ্টিসাধন হয় না। যেমন – আমরা ভাত ও ডাল খেলাম। এই খাবারগুলোর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদি জটিল অবস্থায় থাকে। এই জটিল অবস্থায় ভাত বা ডাল সরাসরি শরীরে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং শরীরের কোনো কাজে আসবে না।

শরীরের গ্রহণ উপযোগী হতে হলে প্রথমে ভাত ও ডাল ভেঙে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হবে। অর্থাৎ এদের মধ্যে অবস্থিত কার্বোহাইড্রেট ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হবে, প্রোটিন ভেঙে এমাইনো এসিডে পরিণত হবে, তারপর এই সরল উপাদানগুলো শোষিত হয়ে শরীরের পুষ্টি সাধন করবে। তাই খাবার খাওয়ার পর তা শরীরের উপযোগী অবস্থায় পরিণত করার জন্য বা গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পরিণত করার জন্য এবং দেহের কোষগুলোতে পাঠাবার আগের পরিপাক ও শোষণের প্রয়োজন হয়।

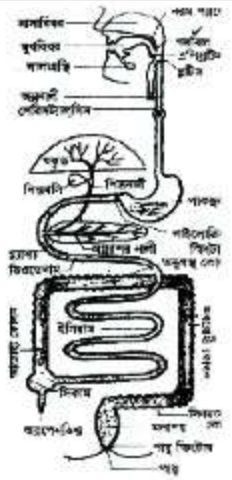

চিত্র- মানুষের পৌষ্টিক তন্ত্র (সরল চিত্র)

পরিপাক– খাবার খাওয়ার পর তা ভেঙে গিয়ে জটিল অবস্থা থেকে সরল অবস্থায় পরিণত হওয়াকে পরিপাক বলে।

শোষণ– পরিপাক হওয়ার পর যে সরল উপাদানগুলো তৈরি হয় সেই উপাদানগুলো যে প্রক্রিয়ায় রক্তস্রোতে প্রবেশ করে তাকে শোষণ বলে।

পরিপাকতন্ত্র– মানবদেহের যে অঙ্গগুলো পরিপাক ও শোষণের কাজ করে থাকে তাদেরকে এক কথায় পরিপাকতন্ত্র বলে।

এই কাজগুলো আমাদের দেহের পরিপাকতন্ত্রে ঘটে থাকে। আমরা যে খাবারগুলো খাই সেগুলোতে পুষ্টি উপাদানগুলো জটিল অবস্থায় থাকে এবং এই জটিল অবস্থায় পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হতে পারে না এবং কোনো কাজে আসে না। কিন্তু যখন খাবারগুলো পরিপাক হয় তখন জটিল পুষ্টি উপাদানগুলো ভেঙে গিয়ে সরল উপাদানে পরিণত হয়। সেই সরল উপাদানগুলো আবার শোষিত না হওয়া পর্যন্ত দেহে কোনো প্রকার কাজ করতে পারে না।

বিভিন্ন ধরনের খাবার গ্রহণ (পুষ্টি উপাদানগুলো বিভিন্ন খাদ্যের মধ্যে জটিল অবস্থায় থাকে)	খাদ্য পরিপাক ⇨	খাদ্য সরল অবস্থায় পরিণত হয় (পুষ্টি উপাদানগুলো সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত হয়)	শোষণ ⇨	দেহের রক্তস্রোতে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান রক্ত থেকে বিভিন্ন কোষে পৌঁছে যায়

খাদ্য পরিপাক ও শোষণের পরিণতি

ওপরের ছক থেকে বলা যায় যে, জটিল পুষ্টি উপাদানগুলোকে সরল ও শোষণযোগ্য উপাদানে পরিণত করার জন্য পরিপাকের প্রয়োজন হয়। আবার পুষ্টি উপাদানগুলোকে দেহের কোষে কোষে পৌঁছানোর জন্য ও পুষ্টি সাধন করার জন্য শোষণের প্রয়োজন হয়।

কাজ ১– খাবার খাওয়ার পর দেহের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়া ঘটে তা ধারাবাহিকভাবে লেখো।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. খাদ্যের উপাদান কয়টি?

ক. ৫টি খ. ৬টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি

২. বাড়ন্ত শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কোনটি প্রয়োজন?

ক. কার্বোহাইড্রেট খ. প্রোটিন
গ. স্নেহ পদার্থ ঘ. খনিজ লবণ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিতার বয়স আট বছর। সে শুধু সবজি দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করে। রিতা তার সমবয়সিদের সাথে খেলতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠে। লেখাপড়ায় তেমন আগ্রহ নেই। তার মা তাকে কোনো কাজ করতে বললে সেটি সে করতে চায় না। সব ব্যাপারে রিতার এ অনাগ্রহ তার পরিবারকে ভাবিয়ে তোলে।

৩. রিতার খাদ্যে কোন উপাদানের অভাব রয়েছে?

ক. প্রোটিন খ. খনিজ লবণ
গ. কার্বোহাইড্রেট ঘ. পানি

৪. রিতার দৈনন্দিন খাদ্যে নিচের কোন তালিকাটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত–

ক. খেজুর, কিশমিশ, কলা, আনারস খ. ডাল, বাদাম, সয়াবিন, শিমের বিচি
গ. তেল, ঘি, মাখন, নারিকেল ঘ. সামুদ্রিক মাছ, কলিজা, পনির, ডিমের কুসুম

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১.

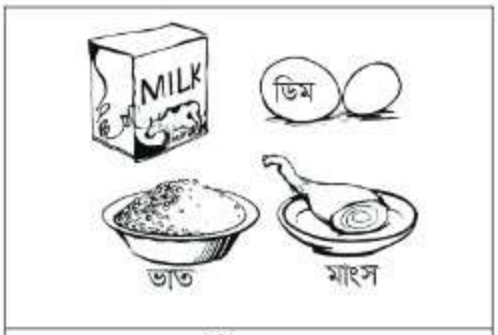

চিত্র–১

চিত্র– ২

ক. ভিটামিন কী?

খ. পরিপাকতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কী?

গ. ১ নং চিত্রের খাদ্যগুলো মানবদেহে কোন ধরনের কাজ করে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. তুমি কি মনে করো ২ নং চিত্রের খাদ্যগুলো প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প পরিমাণে গ্রহণের ফলে মানবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. দশ বছরের চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে তানহা। দুই থেকে তিন দিন হলো তার জ্বর ভালো হয়েছে। কিন্তু সে পড়ালেখা করতে পারছে না। অধিকাংশ সময় শুয়ে কাটায়। তার মা তাকে দুধ, পুডিং, সেমাই, কলিজা ও ডাল জাতীয় খাবার বেশি করে খেতে দেন।

ক. পরিপাক কী?

খ. ডায়রিয়া হলে শরীরে ডিহাইড্রেশন হয় কেন?

গ. মা তানহাকে যে খাদ্যগুলো খেতে বলে সেগুলো কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান?

ঘ. তানহার বর্তমান অবস্থা উত্তরণের জন্য মায়ের দেওয়া খাদ্যগুলো কতটুকু উপযোগী? ব্যাখ্যা করো।